Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Department
Jagannath University Dhaka.

মেঘনাদবধকাব্যে মানবভাগ্য

গ্রীক পুরাণে শুক্লবসনা তিনজন ভাগ্যদেবীর উল্লেখ আছে যারা কর্মসূত্রে এবং দায়িত্বপালনে একে অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জীবনের সূতো যার হাতে তার নাম ক্লোথো। জীবনের পরিমাপ যে করছে তার নাম ল্যাকেসিস এবং যাকে কখনও এড়িয়ে যাওয়া যায় না তার নাম এট্রোপোস। মহাপ্রভু জীউস মানুষের জীবনের সর্বনিয়ন্ত্রণকারী দেবতা। বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা তিনি ভাগ্যদেবীগণকে জানিয়ে দেন।[১]

ফেইট হচ্ছে অদৃষ্ট–নিয়তি। দুর্জয় দ্বিধাহীন, অশেষ শক্তিধর দৈবই মনুষ্যজীবনে সর্বাপেক্ষা বলবান। পুরুষকার দৈবের সম্মুখে ব্যর্থকাম হয়, মনুষ্যের সকল শক্তি, ধর্মাধর্মবোধ নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাহলে দেখছি নিয়তি হচ্ছে এক প্রকার পূর্বনির্ধারিত বিশ্ববিধান। প্রাচীন গ্রীক কাব্যে নিয়তি কখনো দেবতাদের ইচ্ছা বা আদর্শের বিরোধী ছিল। 'হোমার'-এর হাতে এর পরিবর্তন ঘটে। 'হোমারে'র কাব্যে নিয়তি এবং দেবতা সহগামী এবং একই সাধিকা শক্তির অংশ। 'হোমার' এই উভয় শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করেননি।

'নেমেসিসে'র[২] অর্থ হচ্ছে প্রতিফল অথবা দেবতাদের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ–মহাপাপের সেই শাস্তি যা অন্যায়কারীকে কোন না কোন সময়ে স্পর্শ করবেই। গ্রীক পুরাণে 'নেমেসিস' হচ্ছেন অধোভুবনের দেবী, রাত্রি এবং জিঘাংসা দেবীর কন্যা যিনি মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাপ করেন এবং অবিমৃষ্যকে শাস্তি দেন। 'নেমেসিসে'র পূর্ব অবস্থাকে গ্রীক ভাষায় বলা হয় 'আইডস', যার অর্থ হচ্ছে লজ্জা বা সম্মানবোধ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও প্রমুক্ত, তখনই 'আইডস' ও 'নেমেসিস' ক্রিয়াশীল হয় এবং মানুষ তখনই সম্পূর্ণ স্বাধীন যখন কোন দিক থেকে কোন বাধ্যবাধতা থাকে না। যে ব্যক্তি সমস্ত নীতি ও শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করেছে, যে কখনো কোন বস্তু বা ঘটনার সম্মুখে সন্ত্রস্ত নয়, যে সম্পূর্ণ স্বাধীন, 'নেমেসিস' সাধারণত তার মধ্যেই প্রকাশ পায়। দেখা যাবে যে তার স্বাধীন গতির মধ্যে হঠাৎ এমন কিছু ঘটবে যা তাকে সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানেই হোক, অস্বস্তি দেবে। এই অস্বস্তিকর অবস্থাই নেমেসিসের ইঙ্গিতে বহন করে। গ্রীক সাহিত্য কয়েকটি বিশেষ কারণে 'নেমেসিস' সক্রিয় হয়; প্রথমত. ভীরুতা ও মানসিক দুর্বলতা; দ্বিতীয়ত,

মিথ্যাভাষণ ও কর্তব্যের মধ্যে মিথ্যার আভাস; তৃতীয়ত, অসম্ভ্রমবোধ ও রূঢ়তা; চতুর্থত, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা। উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের মনে লজ্জা অথবা অস্বস্তির ভাব জাগরিত হতে পারে। এই অস্বস্তির ভাব থেকে মুক্তি পাবার দুটি উপায় আছে–কারণগুলো থেকে দূরে থাকা অথবা তাদের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অদৃষ্টের প্রতিশোধ বা পরিহাস জাজ্বল্যমান হয়।

'ভাজিল'-এর 'ইনিদ'-এর মধ্যে 'fatum' বলে একটি কথা আছে।[৩] এ শব্দটি গভীর অর্থবাচক। এর কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হচ্ছে Destiny- মানবভাগ্য। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করিনে কেন, এ শব্দটির পুরোপুরি অর্থ- জ্ঞাপন কখনোই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা ভাগ্য আছে, যদিও কোন কোন লোক বিশেষ ভাবে 'নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ'। 'ইনিস' একজন নিয়তি-নির্দিষ্ট পরুষ, কেননা 'ভার্জিলে'র চক্ষে তার উপর পাশ্চাত্য জগতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে; কিন্তু এই নিয়তি-নির্দিষ্টতাকে কোনক্রমেই ব্যখ্যা করা যায় না। এক অর্থে এটা দায়িত্বভার সম্পর্কে সজ্ঞানতা। এটা আত্মপ্রশংসা বা অহমিকাবোধ জাগাবে না, কেননা 'ভার্জিল' ভাবছেন যে কোনো একটা বিশেষ দায়িত্ব যার উপর আরোপিত হয়েছে, তার কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে দায়িত্ব যার উপর অর্পিত হয়েছে, সে কাজ করবে যন্ত্রস্বরূপ বা নির্দেশবহরূপে। যে মুহূর্তে সে নিজেকে সমস্ত শক্তির উৎস বলে মনে করছে এবং একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হবে, তখনই সে নির্যাতিত হবে এবং সর্বাস্বান্ত হবে। ইনিস ভাগ্যের নিগূঢ়তম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু সে কখনো নিজেকে কোনো শক্তির উৎস বলে মনে করে না। সে জানে যে ভাগ্যকে কামনা করে পাওয়া যায় না, আবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকে যে অতিক্রমও করা যায় না। তাহলে সে কোন শক্তির দাস হল? দেবতাদের নয়, কেননা অনেক সময় দেবতাও তো যন্ত্রস্বরূপ। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ভাগ্যের কল্পনা মূলত রহস্যাবৃত, কিন্তু এমন রহস্য যা যুক্তিবিরোধী নয়, কেননা আমরা ভাগ্যের সচলতা এবং সক্রিয়তা থেকে একটি তথ্য জেনেছি যে এই পৃথিবী এবং মানুষের ইতিহাসের ধারার গভীর অর্থ আছে।[৪]

গ্রীক সাহিত্যে নিয়তির বিচিত্র লীলায় মানুষ অত্যন্ত অসহায়। নিয়তি সেখানে পূর্বনির্ধারিত বিশ্ববিধান, যাকে কোনক্রমেই অতিক্রম করা যায় না। মানুষ জানে যে নিয়তি-নির্দেশ কখনোই অতিক্রান্ত হতে পারে না; কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও সে অন্ধভাবে অথবা নিজের অজ্ঞাতসারে নিয়তির বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা তাকে অতিক্রম করতে চায়। অবশেষে বিপুল শক্তিধর নিয়তি মানুষকে চরমভাবে নিঃশেষ করে এবং তখন মানুষের পরাজয়, হাহাকার এবং যন্ত্রণায় আমরা ভীত হই। একটি উদাহরণ দিলে এ কথাটি স্পষ্ট হবে : 'ইদিপাস'-এর কাহিনী আমরা জানি। সেখানে মানুষের অসহায়তা চরমভাবে চিত্রিত হয়েছে। 'ইদিপাস' হচ্ছে 'লেয়াস্' এবং তার স্ত্রী 'জুকাষ্টা'র পুত্র। নবজাতকের নামকরণের পুর্বেই 'এপোলো'র দৈববাণী এলো যে ভাগ্যচক্রে একদিন এ পুত্র তার পিতাকে হত্যা করবে এবং বিধবা মাকে বিয়ে করবে। 'এপোলো'র দৈববাণী 'লেয়াস্'

অবিশ্বাস করেননি, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও তিনি এক মেষপালককে নির্দেশ দিলেন পুত্রকে পর্বতপ্রান্তে পরিত্যাগ করে আসতে। ভাগ্যের নির্দেশ অন্যথা হলো না, তাই থীবীর মেষপালক করুণাপরবশ হয়ে শিশুকে এক করিন্থিয়ান মেষপালকের হস্তে সমর্পণ করলো। করিন্থিয়ান মেষপালক ছিল করিন্থের সন্তানহীন নৃপতি 'পলিবস'-এর আজ্ঞাবহ। সে শিশুকে পলিবসের হাতে সমর্পণ করলো। 'পলিবস' শিশুকে দত্তক গ্রহণ করলেন এবং নাম দিলেন 'ইদিপাস'। 'ইদিপাস' যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং করিন্থের যুবরাজ বলে সর্বত্র মান্য হলেন। এ সময় তিনি 'এপোলো'র দৈববাণী শুনাতে পেলেন যে তিনি পিতৃঘাতী হবেন। তিনি দৈববাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্যে পালক পিতাকে আপন পিতা ভেবে করিন্থ পরিত্যাগ করলেন। নির্দেশবিহীনভাবে পরিভ্রমণরত অবস্থায় থীবীর সীমান্তে তিনি তাঁর যাত্রায় বাধাপ্রদানরত এক পথচারীকে হত্যা করেন। এই পথচারী ছিলেন তাঁর পিতা। ভাগ্যকে তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে চরম নিষ্ঠুরতায় ভাগ্য প্রকাশমান হলো। থীবীর অভ্যন্তরে এসে তিনি দেখেন যে দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় চলছে। ভয়াবহ স্ফিংসের জন্য দেশবাসী সন্ত্রস্ত। স্ফিংসের ধাঁধার উত্তর কেউ দিতে পারছে না এবং অপারগ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে ইদিপাস স্ফিংসের শক্তি অপহরণ করলেন এবং সকৃতজ্ঞ থীবীবাসিগণ তাঁকে রাজা বলে গ্রহণ করলো। 'ইদিপাস' রাজা হয়ে 'লেয়াসে'র পত্নী 'জুকাস্টা'কে বিয়ে করলেন। 'ইদিপাসে'র ঔরসে 'জুকাস্টার' গর্ভে পুত্রকন্যার জন্ম হলো। 'ইদিপাসে'র অজ্ঞাতসারে দৈববাণী সফল হল। এখন বাকী রইল 'ইদিপাসে'র কাছে সমস্ত সত্য স্পষ্ট হওয়া। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইদিপাস সর্বতোভাবে নিরীহ। তিনি ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং জনকল্যাণী। তাঁর নিজের দোষে নয়, কিন্তু ভাগ্যের নির্দেশে তিনি চরমভাবে নিঃশেষিত হচ্ছেন। সমস্ত সত্য যেদিন তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো, সেদিন তাঁর কোন প্রকার ত্রাণের উপায় নেই। নিয়তি তাঁকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছে আপন সত্যকে স্পষ্ট করার জন্যে এবং অসহায় ইদিপাস লাঞ্ছিত এবং নিঃশেষিত হয়েছেন। নিয়তি এখানে অমোঘ. একাগ্র, নির্মম এবং নিশ্চিন্ত। যন্ত্রণায় বিচিত্র বিকাশের মধ্যে 'ইদিপাসে'র অসহায়তা দেখে আমরা বিহ্বল হই এবং চরমভাবে শঙ্কিত হই। নিয়তি যা বিশ্ববিধানের এই দুর্বার গতি এবং অপ্রতিরোধ্য আবেগের সম্মুখে মানুষ বাত্যাতাড়িত তৃণের মতো।[৫]

'সেক্‌সপীয়রে'র নাটকেও নিয়তিলাঞ্ছিত মানুষের পরিচয় পাই। সেখানেও মানুষ অসহায়; কিন্তু সেখানে তার অসহায়তার জন্য সে নিজেই দায়ী। শক্তিমান নায়ক নিজের শক্তির উপর বিশ্বাসী হয়ে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু আপন চরিত্রের কোনো বিশেষ দুর্বলতার কারণে সে এমন একটা পথ অবলম্বন করেছে যে এ পথে তার জন্য সর্বনাশ আছে, কিন্তু আনন্দ নেই। সে জানে যে এ পথে সর্বনাশ আসতে পারে, তাই সর্বনাশ রোধ করবার চেষ্টার তার অন্ত নেই; কিন্তু আপন রিপুর কাছে সে একান্ত অসহায়, তাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। আমরা এখানে ম্যাকবেথের উদাহরণ আনতে পারি। ম্যাকবেথ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ন্যায়বান আদর্শ পুরুষ; কিন্তু তার হৃদয়ে

উচ্চাকাঙ্ক্ষারূপ দুর্বলতা আছে। এ দুর্বলতাকে সে কোনোক্রমেই অতিক্রম করতে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত এ দুর্বলতার কারণেই অনবরত অন্যায় পথে তার পদাচারণ ঘটালো। এ নাটকে আমরা ভাগ্যের সামনে মানুষের অসহায়তার চিত্র দেখি; কিন্তু এ নিয়তি সে নিজেই নির্মাণ করেছে।[৬]

'মেঘনাদবধ কাব্যে' মাইকেল মধুসূদন দত্ত অল্প পরিসরের মধ্যে গ্রীক নিয়তিকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে এ কাব্যে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের শাস্তি এবং কৃতকর্মের ফলভোগ আছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে এই পূর্বজন্মের কথা এবং কৃতকর্মের কথাই পাই; কিন্তু বিশেষ ভাবে অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে এগুলো উক্তি স্বরূপেই আছে, মহাকাব্যের ঘটনা-সংস্থানে এগুলোর কোন পরিচয় নেই। তবুও এ উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আমাদের প্রথম প্রমাণ করতে হবে যে এই প্রাক্তন এবং কৃতকর্মের ফলভোগ বিভিন্ন ঘটনা বা আবেগের মধ্য দিয়ে সমর্থিত হয়নি। এটা প্রমাণ হলেই প্রাক্তনগত সমস্ত উল্লেখকে আমরা বর্জন করতে পারবো এবং তারপরেই আমাদের প্রমাণ করার প্রয়োজন হবে যে এ কাব্যের ঘটনা সংস্থানে, বিভিন্ন সংঘাতে এবং চরিত্রগত আবেগে গ্রীক নিয়তিবাদ সমর্থিত হয়েছে কি হয়নি।

প্রথম সর্গে প্রাক্তন-সংক্রান্ত উক্তিগুলো এই :

১. রাবণের উক্তি :

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়মণি।
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই?
... ...
হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে?"[৭]

২. চিত্রাঙ্গদার উক্তি :

"কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ রাজা, এসেছে এ দেশে

রাঘব?

... ...
তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষস-কুলে, মজিলা আপনি!"[৮]

৩. রমার উক্তি : "যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"[৯]

রাবণের উক্তিতে আত্মকৃত অন্যায় এবং পাপবোধ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা আছে: কিন্তু রাবণের চেতনায় পাপ সম্পর্কে কোনো প্রকার সজ্ঞানতা নেই। রাবণ মূলত অভিযোগ করছে যে ক্রমান্বয়ে সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে কেন? সীতাকে যে অপহরণ করে নিয়ে এলো সে সম্পর্কেও রাবণের অপরাধের মনোভাব নয়। সে দোষারোপ করছে সূর্পণখাকে। সূর্পণখা পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণকে দেখে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে; কিন্তু লক্ষ্মণ তার নাসিকা কর্তন করে। সে জন্যই সূর্পণখার দুঃখে দুঃখিত হয়ে সীতাকে অপহরণ করে রাবণ। এ অপহরণের ব্যাপারে রাবণের মনে কোনো প্রকার পাপবোধের পরিচয় নেই। রাবণের বক্তব্য হচ্ছে. সূর্পণখার প্রতি করুণাপরবশ হয়ে সে সীতাকে অপহরণ করেছে। এখানে কোন প্রকার অসদাচরণ অথবা মানসিক বৈকল্যের পরিচয় নেই। অপহৃত সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র এসেছে লঙ্কায় এবং সেখানে উভয় পক্ষের সংগ্রামে রাবণ ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হচ্ছে। সামর্থ্য তার অশেষ, কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও কেন যে সে ক্রমান্বয়ে পরাজিত হচ্ছে তার কারণ সে খুঁজে পায় না। রামের সঙ্গে বিরোধের কারণ সে খুঁজে পেয়েছে, কিন্তু 'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জ্বল নাট্যশালা'-রূপ সুন্দর লঙ্কাপুরীর সমস্ত 'দেউটি' কেন যে নিভে যাচ্ছে তার কারণ সে খুঁজে পায় না। রাবণের উক্তিতে প্রাক্তনের বোধ নেই অথবা কৃতকর্ম-জনিত শাস্তিরও সচেতনতা নেই।

চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে রাবণের উপর দোষারোপ আছে। চিত্রাঙ্গদা স্পষ্টভাবেই বলেছে, সীতাকে অপহরণ করা হয়েছে বলেই লঙ্কাপুরে আজ কালাগ্নি জ্বলেছে। নিজ কর্মফলে রাবণ সমস্ত রাক্ষসকুলকে আজ সর্বস্বান্ত করছে।এটা ক্ষুব্ধ এবং বেদনালাঞ্ছিত মাতার উক্তি। এটা উক্তিস্বরূপই রয়েছে, রাবণের দিক থেকে এর কোনো প্রতিক্রিয়া জাগেনি। যতটুকু প্রতিক্রিয়া জেগেছে তা হচ্ছে রাক্ষসকুলের মানরক্ষার জন্যে আবার নতুন করে

যুদ্ধের প্রস্তুতি। রাবণ এই উক্তির উত্তরে কর্মফলের কথা উল্লেখ করেনি। ক্ষোভে অভিমানে শোকার্ত বলছে :

'এত দিনে'। (কহিলা ভূপতি)
'বীরশূন্য লঙ্কা মম! এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!'[১০]

দেবতারা অবশ্য অনবরত রাবণের পাপের কথা বলছেন, তার কর্মফল এবং ভাগ্যদোষের কথা বলছেন; কিন্তু এ-কাব্যের গতিবিধিতে এবং রাবণের চরিত্র প্রকাশের মধ্যে এর সমর্থন আমরা পাই না। গ্রীক কাব্যের মধ্যে দেবতারা কোনো একটি পক্ষের সমর্থক কখনও নন, মানুষে মানুষে দলভাগের মতো দেবতারাও সেখানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন; তাই ভাগ্য সেখানে দেবতাদের কৃত্যরূপে প্রকাশিত হয় না, আমরা সেখানে ভাগ্যের একটি বিচ্ছিন্ন সর্বগ্রাসকারী অবশ্যম্ভাবী রূপ পাই। মধুসূদন তাঁর সমস্ত দেবতাকে এক বিশেষ ষড়যন্ত্রসূত্রে গ্রথিত করেছন; তাই যেখানে দেবতারা প্রাক্তনের ফলকে প্রকাশমান করার জন্যে ছুটে চলেছেন, সেখানে মূলত তাঁরা আপন ষড়যন্ত্রকেই সফলকাম করছেন। এ কারণে আমরা বলতে পারি যে রাবণের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় সম্পর্কে তাঁরা যে সমস্ত কথা বলছেন, সেগুলো মূলত তাঁদের ষড়যন্ত্রের সমর্থনসূচক। তাঁরা সম্মিলিত ভাবে একে অন্যের সমর্থনে এবং নির্ভরতায় এবং বিশেষ এক যুক্তিধারা অবলম্বন করে রাবণের অজ্ঞাতসারে তাকে চরম ভাবে নিঃসম্বল করছেন। মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণ পূর্ণভাবে সর্বস্বান্তই হয়েছে বলা যেতে পারে। এ কারণেই দেবতাদের উক্তিকে এখানে ভাগ্যের নির্দেশ বলে মানা যেতে পারে না; আর যদি কৃতকর্মের ফলের কথাই বলি তাহলেও বলতে হয় যে রাবণের চরিত্রবিকাশের মধ্যে এর আভাস মাত্র নেই। দেবতারাই অনবরত বলছেন যে লঙ্কাপুরী পাপে পূর্ণ এবং রাবণ তার অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি পাবেই: কিন্তু এই গ্রন্থের কোথাও লঙ্কাপুরীর পাপক্রিয়ার অথবা রাবণের কোনো প্রকার বিকল আচরণের পরিচয় নেই। রাবণের চরিত্র বিশ্লেষণ-সূত্রে আমরা দেখছি যে রাবণ দেশপ্রেমী, প্রজাবৎসল, শক্তিধর এবং অশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি। করুণা এবং সহানুভূতিতে সে যেমন আশ্চর্যরকম কোমল এবং মানবীয় তেমনি শত্রুর সম্মুখে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশের সমস্ত শক্তিকে একত্র করার ক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্ত।

এখানে 'হোমারে'র দেব-কল্পনা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। 'হোমারে'র দেবতারা অমর সন্দেহ নেই; কিন্তু মানব রূপে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ সৌন্দর্যে এবং দেহগত রূপে তারা মানবকল্প। তাদের ক্ষমতা প্রায় অসীম এবং রূপের প্রভাও

যথেষ্ট; কিন্তু মানুষের মতো তাদের দুর্বলতা আছে এবং কর্মপন্থার কারণ আছে। তারা মানুষের আবেগ এবং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত এবং মানবের কার্যধারায় ন্যায়ানুসরণ তাদের ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে।[১১]

দেবতাদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এখানে যে দেবতারা শঙ্কামুক্ত এবং আনন্দময়, অন্য পক্ষে মানুষ কর্মে, আকাঙ্ক্ষায় এবং আকুলতায় নিয়ত পীড়িত। এই পার্থক্য 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি' দুই মহাকাব্যেই সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ওদিসি'র মধ্যে এই পার্থক্য আশ্চর্য সজীবতায় বর্ণিত হয়েছে, বিশেষ করে পঞ্চম পুস্তকে যেখানে 'ওদিসিয়ার্স 'কেলিপ্সো'র অমরত্বের দানকেও অস্বীকার করছে। 'ওদিসিয়াস' দেবতাদের অমরত্ব এবং অনন্ত যৌবন কামনা করেনি।

'ওদিসি'তে সর্বশক্তিমান দেবতা 'জিউস'। 'জিউস' হচ্ছেন 'ক্রোনোসে'র পুত্র। 'জিউস' সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের প্রভাবমুক্ত নন, যদিও তিনি মানুষের ভাগ্যকে পরিচালনা করেন। তিনি করুণাপরায়ণ, ন্যায়বান। ভাগ্যের নির্দেশে তিনি মানুষকে হয়তো শাস্তি দেন অথবা যন্ত্রণা দেন, কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পরিকল্পনা বা কার্যক্রমের দায়িত্ব থেকে তিনি মুক্ত। 'জিউসে'র সঙ্গে ভাগ্যের সম্পর্ক কি, তার পরিচয় 'ইলিয়দে'র ষোড়শ পুস্তকে কিছুটা পাওয়া যায়। 'সারপেদন'কে বিপদগ্রস্ত দেখে 'জিউস' তাঁর স্ত্রী হেরে-কে বলছেন :

'ভাগ্য আমার প্রতি অকরুণ। সারপেদনকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি অথচ তাকে বাঁচাবার উপায় নেই। দেখতে পাচ্ছি যে পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু অবধারিত। আমার মন এখন দ্বিধাগ্রস্ত, আমি কি তাকে জীবিতাবস্থায় যুদ্ধের বেদনা ও অশ্রু-প্রবাহ থেকে মুক্ত করে লিসিয়ার সজীব ভূমিতে সরিয়ে আনব? না, পেত্রোক্লসের হাতে তাকে নিহত হতে দেব?"

উত্তরে হেরে বলছে ঃ

"তুমি আমাকে অবাক করছো। যার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, যে পতিত হবে যুদ্ধে, তাকে কি তুমি মৃত্যুর বেদনা থেকে রক্ষা করতে চাও? যদি তুমি সারপেদনকে ভালোবাস, তবে তোমার কর্তব্য হবে ভাগ্য-নির্দেশ মতো পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে দেওয়া।"

এখানে আমি এদের সংলাপটুকু E.V.Rieu-এর 'ইলিয়দে'র ইংরেজী অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি :

"The son of Cronos of the Crooked Ways saw what was happening and was distressed. He sighed and said to Here, his sister and his wife: `Fate is unkind to me— Sarpedon, whom I dearly love, is destined to be killed by Patroclus, son of Menoetius. I wonder now— I am in two minds. Shall I snatch him up and set him down alive in the rich land of Lycia far from the war and all its tears? Or shall I let him fall to the son

of Menoetius this very day?' `Dread son of Cronos, you amaze me!' replied the ox-eyed Queen of Heaven. `Are you proposing to reprieve a mortal man whose doom has long been settled, from the pains of death?...No; if you love and pity Sarpedon, let him fall in mortal combat with Patroclus, and when the breath has left his lips send Death and the sweet god of sleep to take him up and bring him to the broad realm of Lycia, where his kinsmen and retainers will give him burial, with the barrow and monument that are a dead man's rights.'[১২]

[ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে, তা দেখতে পেয়ে ক্রোনোসের পুত্র বিষাদ-ভারাক্রান্ত হল। সে তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে হেরেকে, যে একই সঙ্গে তার ভগ্নী ও স্ত্রী, বললো, 'ভাগ্য আমার প্রতি নিষ্করুণ– কারণ যে সারপেদনকে আমি এত ভালোবাসি, মিনতিয়াসের পুত্র পেত্রোক্লসের হস্তে তার মৃত্যু অবধারিত। আমি এখন চিন্তিত হচ্ছি– আমার মন এখন দ্বিধাগ্রস্ত। আমি কি তাকে জীবন্ত অবস্থায় যুদ্ধের বিষাদ এবং অশ্রুর বন্যা থেকে মুক্ত করে লিসিয়ার উর্বর-ভূমিতে নিয়ে আসতে পারবো? না, মিনতিয়াসের পুত্রের হাতে তাকে নিহত হতে দেব?

স্বর্গের রানী জবাব দিলেন, 'হে ক্রোনোসের ভীষণ পুত্র, তুমি আমাকে অবাক করছো। অনেক দিন পূর্ব থেকেই যার মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে আছে, সেই মরণশীল মানুষকে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চাও?...না, যদি তুমি সারপেদনকে ভালোবাস এবং তার প্রতি সহানভূতিশীল হও, তবে তোমার কর্তব্য হবে বিধিলিপি অনুসারে পেত্রোক্লসের হাতে তার মৃত্যু ঘটতে দেওয়া। এতে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে মৃত্যু এবং নিদ্রাদেবতা এসে তাকে লিসিয়া রাজ্যে নিয়ে যাবে! সেখানে তার আত্মীয়স্বজন তাকে সমাহিত করবে এবং তার সমাধির উপর গড়ে উঠবে বিরাট স্মৃতিসৌধ।]

এখানে আমরা দেখছি যে নিয়তি হচ্ছে একটা বিশেষ সত্য যা নিশ্চল, অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বব্যাপ্ত, যাকে অতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়, অথচ মানুষ অনবরতই তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে এবং এই অতিক্রমের চেষ্টায় লাঞ্ছিত এবং বিপর্যস্ত হচ্ছে। গ্রীক কাব্যে দেখতে পাই, মানবের নিয়তি সম্বন্ধে দেবতারা অবহিত। দেবতাদের কেউ নিয়তিকে অসফল করতে চাচ্ছে আবার কেউবা নিয়তিকে সমর্থন করছে। নিয়তিকে সমর্থন করতে যেয়েও কখনো কখনো কোনও কোনও দেবতা দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু সর্বপ্রকার আপত্তি এবং দ্বিধাকে অতিক্রম করে নিয়তি প্রকাশমান হচ্ছে। এক কথায় পৃথিবীর অস্তিত্বের মত নিয়তিও সুনিশ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য। নিয়তির এই রূপ 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি' কাব্যের মধ্যে বিস্তৃতভাবে প্রকাশমান হয়েছে।

'ইনিদ' কাব্যে নিয়তিকে সত্যরূপে চিত্রিত করা হয়েছে– দিবারাত্রির মত সত্য এবং পৃথিবীর অস্তিত্বের মত সত্য। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দেবতার নির্দেশ মানা। দেশকে ভালোবাসা, পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং অনুচরদের প্রতি সত্য-সম্বন্ধে অর্থাৎ করুণায়, মমতায় ও সমর্থনে বিজড়িত থাকা, তবেই নিয়তির স্বরূপটি প্রকাশমান হবে তার কাছে কেননা সে

সব দিক থেকে 'সত্য'। এ সত্যকে কিন্তু উপলব্ধি করতে হয় এবং সে জন্যই ইনিসের মত বলিষ্ঠ প্রাণবান ব্যক্তিকে ভার্জিল তাঁর কাব্যের নায়ক করেছেন। ইনিস হচ্ছে ভাগ্যনির্দিষ্ট পুরুষ এবং ইনিস তা নিজেও অনুভব করে। দেবতারা স্বপ্নে, অনুভূতিতে, প্রেরণায় এবং ইঙ্গিতে বিভিন্ন সময়ে এ সত্য তার কাছে স্পষ্ট করে। ইনিস ভাগ্যনির্দিষ্ট পুরুষরূপে ইতলীতে একটি সম্রাজ্য জয় করবে। দৈবশক্তি তাকে পথের নির্দেশ দেয় এবং তাকে সাহায্য করে। একটি প্রচণ্ড সমুদ্র-ঝড়ে বিভ্রান্ত হয়ে ইনিস তার দলবলসহ উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ বন্দরে পদার্পণ করলো। এখানে ইনিস কার্থেজের রানী 'দিদো'র প্রণয়াসক্ত হল। ইনিস এবং দিদো একত্রে বসবাস করতে লাগলো। ইনিস ভুলে গেলো যে নিয়তি তাকে ইতালীতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে এবং সেখানে সে নতুন সাম্রাজ্য জয় করবে। অনেক দিন চলে যায়, তারপর নিয়তির নির্দেশের কথা ইনিসের স্মরণে আসে। ইনিস দিদোকে পরিত্যাগ করে এবং আবার সমুদ্রযাত্রায় নামে। বঞ্চিতা দিদো ইনিসকে অভিশাপ দেয় এবং অবশেষে আত্মহত্যা করে।

'ইনিদ' কাব্যে ভাগ্যের এই গতি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং ইনিস নিয়তির নির্দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইনিসের যাত্রাপথ নিয়তি-নির্ধারিত,কখনো বৈলক্ষণ্য এলেও দৈবরোষ প্রবল হয় এবং বলিষ্ঠ নায়ক বিশ্ববিধান সমর্থিত পথে আবার যাত্র করে।

'মেঘনাদবধ কব্যে' দুটি চরিত্রের বিকাশে এই নিয়তি নির্ধারিত পথ-বিন্যাসের স্বরূপ স্পষ্ট হয়। একজন হচ্ছে লক্ষ্মণ, অন্যজন ইন্দ্রজিৎ। লক্ষ্মণ বিশ্বাস করে যে সে নিয়তি-নির্দিষ্ট পুরুষ, দৈববলে বলী এবং এ কারণে সে জয়লাভ করবেই। ইন্দ্রজিৎকে গোপনে হত্যার জন্যে যখন লক্ষ্মণ রামের কাছে অনুমতি চচ্ছে তখন ভীত সন্ত্রস্ত রাম বলছে ঃ

'কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।'[১৩]

এর উত্তরে লক্ষ্মণের উক্তি হচ্ছে :

'দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে এ ত্রিভুবেনে? দেব কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস নিবাসী
বিরূপাক্ষ ; শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কাল-মেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে! দেবহাস্য উজলিছে ; দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে ;
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদ-প্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল

দেব-আজ্ঞা? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?'[১৪]

এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লক্ষ্মণ নিয়তির নির্দেশ সম্বন্ধে সচেতন এবং সে নিয়তির উপাদানরূপে কাজ করছে, তাই আমরা অনুভব করতে পারি যে তার জয় সুনিশ্চিত। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে মেঘনাদের বিদায়দৃশ্য। মেঘনাদের মানসচেতনা বিপরীত অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। সে একমাত্র শক্তির উপরই বিশ্বাসী। সে নিজেকে কোন বিশেষ শক্তির উপাদানরূপে কল্পনা করতে পারে না– সে নিজেকে জানে সমস্ত শক্তির উৎসরূপে এবং এ কারণেই তার পতন ঘটেছে। তার মাতা যখন বলছে :

'কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার।'[১৫]

তার উত্তরে মেঘনাদ বলছে ঃ

'কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে
চির-জয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম ; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী ;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু
সভয় হইলা আজি, কহ, মা আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?'[১৬]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্মণের দিক থেকে নিয়তি-নির্দিষ্ট একটা দায়িত্বভার সম্পর্কে সজ্ঞানতা আছে। লক্ষ্মণের কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা অর্থাৎ লক্ষ্মণ হচ্ছে নির্দেশবাহক। অন্যদিকে মেঘনাদ নিজেকেই সমস্ত শক্তির উৎস মনে করছে, তাই সে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। সে ভাগ্যের নিগূঢ়তম বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত নয়, সে একমাত্র আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল। যান্ত্রিক অনুগামিতায় লক্ষ্মণ জয়ী আর একান্ত আত্মপ্রত্যয়ে মেঘনাদ পরাভূত। এই বিরোধাভাসে উভয়ের চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং দুর্বলতা একই সঙ্গে আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

লক্ষ্মণের নিশ্চিন্ত দেব-নির্ভরতার পরিচয় 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সর্বত্রই আমরা পাই। রাম বহুবার যুদ্ধ পরিহার করতে চেয়েছে বিপর্যয়ের ভয়ে এবং বহুক্ষেত্রেই পরাজয় তার

কাছে সম্ভাব্য বলে মনে হয়েছে ; কিন্তু লক্ষ্মণ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস করেছে যে মেঘনাদের ধ্বংস তার কাছে অনিবার্য, কেননা দেব-কুল তার সহায়। তৃতীয় সর্গে রাম, প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা দেখে চিন্তিত হয়ে বিভীষণকে বলছে :

'দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভৃগুমান গিরি
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে!
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;
কে রাখে এ মৃগ পালে?'[১৭]

এর উত্তরে সৌমিত্রি শুর বলছে :

'কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি।'[১৮]

এ ভাবে দেখা যায়, লক্ষ্মণ এবং মেঘনাদের শক্তির উৎসকেন্দ্রে দ্বৈতাভাস আছে এবং কবি এই দ্বৈতাভাসের মধ্যদিয়ে নিয়তির পরিচয় দিতে চেয়েছেন। উভয় চরিত্রের আবেগের বিকাশ এবং পরিণতিতে যদিও আদর্শগতভাবে নিয়তির অপরিহার্যতার পরিচয় আছে, কিন্তু নিয়তির নির্দেশকে সার্থক করতে গিয়ে লক্ষ্মণ যে পন্থা অবলম্বন করেছে এবং যার অনুসরণে অবশেষে মেঘনাদের পতন ঘটল, তার সঙ্গে নিয়তির অমোঘ রূপের কোন সম্পর্ক নেই। যদি নিয়তির নির্দেশ এই হয়ে থাকে যে লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদের পরাজয় ঘটবে তাহলে লক্ষ্মণের গোপন ষড়যন্ত্র এবং কাপুরুষোচিত আচরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। নিয়তির অনিবার্যতার পরিবর্তে এখানে শক্তিরূপে স্পষ্ট হচ্ছে দেব-কুলের গ্লানিময় গোপন অসদাচরণ। দেবতারা সর্বশক্তিমান এবং 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই সর্বশক্তিমান দেবতারা–বারুণী থেকে আরম্ভ করে মহাদেব পর্যন্ত– একটি নিকৃষ্টতম গোপন ষড়যন্ত্রে একত্র হয়েছে এবং এদের সকলের সুবিন্যস্ত এবং সুনিশ্চিত কার্যধারায় মেঘনাদ নির্বীর্য এবং নিঃশেষ হয়েছে। এ কাব্যের কোথাও ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় নেই এবং মানব ভাগ্যের চিত্রাঙ্কনে মধুসূদন ব্যর্থকামই হয়েছেন বলতে হবে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' মহাদেবের কল্পনা গ্রীক দেবপ্রভু 'জিউস' থেকে নেয়া ; কিন্তু যেখানে 'জিউস' বিশ্ববিধানকে প্রকাশমান এবং কার্যকরী করেন মাত্র এবং যে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব দায়িত্ব কিছু নেই, সেখানে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাদেবের কার্যকারণের মধ্যে নিয়তি-সমর্থনের স্পষ্ট কোন পরিচয় নেই! আমরা দেখেছি সারপেদনের পরিণতি জানতে পেরে জিউস দেবতার আক্ষেপ এবং মনোবেদনা। জিউস সেখানে সারপেদনকে রক্ষার জন্যে চেষ্টা করছেন এবং ভাগ্যকে কোনও ক্রমে অস্বীকার করা যায় কিনা তার চিন্তা

করছেন। অবশেষে যখন দেখা গেল যে ভাগ্যকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা তাঁর নেই তখন তিনি সারপেদনের পতনকে মহীয়ান করলেন। আমরা সেখানে জিউসের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভাগ্যের অনিবার্যতার একটি সুন্দর পরিচয় পাই। জিউস সেখানে কোনও কর্মের নায়ক নন, ভাগ্য-নির্দেশে তিনি একজনের পতনকে সম্ভবপর করছেন মাত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মহাদেবের উক্তি এই :

"জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা, –বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস সদনে ;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্মফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ; হায় দেবি, কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বর যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।[১৯]"

এখানেও দেখছি, অন্যান্য দেবতার মতো মহাদেবও রাবণের পাপের কথা বলছেন, যে পাপের ব্যাখ্যাসূত্র আমরা কোথাও খুঁজে পাই না। অব্যাখ্যাত এবং অসমর্থিত পাপের কারণে সর্বনাশ হচ্ছে– এখানে গ্রীক নিয়তি বা প্রাক্তন কোনও কিছুরই পরিচয় নেই ; মহাদেবের আচরণে এটাই স্পষ্ট হয় যে তিনি ভাগ্যকে রূপ দিচ্ছেন না ; কিন্তু সমস্ত দেবশক্তির ষড়যন্ত্রের সমর্থক হয়েছেন। মেঘনাদ বা রাবণের জন্যে তাঁর কোনও অনুকম্পা নেই, তিনি নিশ্চিন্তে মেঘনাদের সর্বনাশের নির্দেশ দিচ্ছেন। রাবণের দুষ্কর্মের উল্লেখ আছে এবং প্রাক্তনের গতির কথাও বলা হয়েছে ; কিন্তু এগুলো প্রবচন রূপে এসেছে মাত্র– গভীর বেদনা, অপরিসীম হতাশ্বাস অথবা ভাগ্যের অমোঘ রূপের পরিচয় এর মধ্যে নেই। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেবতাদের পারস্পরিক সংযোগ ধারায় একটি অসাধারণ ষড়যন্ত্রের কুশলী-বিন্যাস ঘটেছে এবং মহাদেবের সমর্থনের পর কার্যক্ষেত্রে সেই ষড়যন্ত্রের প্রকাশ ঘটলো। এখানে ভাগ্য কোথায়? যেহেতু রাবণ এই ষড়যন্ত্রের কুশলী-বিন্যাস সম্বন্ধে অবহিত নয়, তাই তার চিন্তায় ভাগ্যগত অনুভূতির কথা পাই এবং এভাবেই ভাগ্যের এক বিরাট পরিহাসের রাবণ নিঃশেষ হলো। সুতরাং একমাত্র রাবণ চরিত্রকে অর্থাৎ এই চরিত্রের চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রবাহকে অনুসরণ করলেই আমরা ভাগ্যের অমোঘ এবং নিঃসংশয় রূপের পরিচয় পাই। রাবণের বিভিন্ন উক্তিতে এই সত্যটি ধরা পড়ে :

১. কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

[প্রথম সর্গ]

২. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদল পতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবেরী তুমি, প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বু স্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

[প্রথম সর্গ]

৩. এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে!
গ্রহদোষে দোষীজনে কে নিন্দে, সুন্দরি!
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি

পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিখী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি-প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।

[প্রথম সর্গ]

৪. বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে
বধিনু যে রিপু আমি বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে.
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি!
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায়? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা বিলাপে?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম.
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর।

[নবম সর্গ]

৫. ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি, তোমার সম্মুখে,–
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি,–বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?

[নবম সর্গ]

রাবণের এ সমস্ত উক্তি সাধারণ সংবাদবহ নয়, এগুলো তার হৃদয়-বেদনা এবং উপলব্ধির সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত। পরাজয়ের অপ্রতিরোধ্য গতি দেখে সে অনুভব করছে যে ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ। কয়েকটি ঘটনায় তার এই অনুভূতিটা প্রবল হয়েছে–

প্রথম, অনবরত শত্রুপক্ষের হাতে দেশের সৌন্দর্য ও শক্তির ক্রমবিপর্যয় ; দ্বিতীয়, রাম কর্তৃক সেতুবন্ধন, যে সেতুবন্ধনের সম্ভাবনা রাবণের কল্পনায় কখনো জাগেনি ; তৃতীয়, যে লক্ষ্মণকে সে নিহত বলে ধারণা করেছিল, তার জীবনপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ, তার জীবনের একমাত্র আশা মেঘনাদকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে মৃত্যু– সেই আশাভঙ্গের কারণে তুলনাহীন বেদনা। এই কয়টি বেদনাময় আকস্মিকতায় ভাগ্যের অমোঘ রূপের যে পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে তার তুলনা যে– কোনও সাহিত্যে বিরল। নিয়তির এই অনিবার্যতার সঙ্গে দেবতাদের সক্রিয় বিরুদ্ধতা সম্পর্কে রাবণের অজ্ঞানতাকে যখন আমরা মিলিয়ে দেখি তখন নিয়তির পরিহাসটা বড় বেশী নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পায় ; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একমাত্র এই নিষ্ঠুরতার কারণেই রাবণ আমাদের হৃদয়ের এত নিকটে।

টীকা

১. "There are Three conjoined Fates, robed in white, whom Erebus begot on Night ; by oame Cloths, Lachesis, and Atropos...Zeus, who weighs the lives of men and informs the Fates of his decisions can, it is said, change his mind and intervene to save whom he pleases, when the thread of life, spun on Clotho's spindle, and measured by the rod of Lachesis, is about to be snipped by Atropo's spears."- The Greek Myths: Robert Graves. ১০ম অধ্যায়ে আলোচিত। ১৯৫৫ সালে Penguin কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটি আমার অবলম্বন ছিলো।

২. (ক) "Nemesis is a personification of the moral reverence for law, of the natural fear of committing a culpable action, and hence of conscience, and for this reason she is mentioned along with 'Aidos'. In later writers, as Herodotus and Pindar, Nemesis is a kind of fatal divinity, for she directs human affairs in such a manner as to restore the right proportions or equilibrium wherever it has been disturbed; she measures out happiness and unhappiness, and he who is blessed with too many or too frequent gifts of fortune, is visited by her with losses and sufferings, in order that he may become humble, and feel that there are bounds beyond which human happiness cannot proceed with safety."— Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, Edited by William Smith, London; Toylor, Walton and Maberly 1844.

(খ) A Companion to Homer, Edited by Alan J. B. Wace and Frank H. Stubbings. (London, Macmillan & Co. Ltd, 1963) গ্রন্থের Social Culture নামক অধ্যায়ে 'নেমেসিস' এবং 'আইদস' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

৩. Virgil: The Aeneid, a new translation by W. F. Jackson Knight: The Penguin Classics. 1956— ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ভার্জিলের জন্ম হয় ইতালীর উত্তরাঞ্চলে মানতুয়া শহরে খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ সালে এবং মৃত্যু হয় খ্রীষ্টপূর্ব ১৯ সালে। 'ইনিদ' তাঁর সর্বশেষ এবং বৃহত্তম ও মহোত্তম কাব্য। এ কাব্যে রোমক জাতির একটি কাল্পনিক উদ্ভবের কাহিনী বর্ণিত আছে।

৪. ভার্জিলের কাব্যে– ইনিস প্রেমের দেবী ভিনাসের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন মানুষ। ভিনাস সকল দুর্যোগে ইনিসকে রক্ষা করেছেন। অন্যপক্ষে দেবতাদের রানী জুনো ইনিসের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু রোমক জাতির প্রতিষ্ঠাতা হবেন বলে ইনিস ছিলেন নিয়তি নির্দিষ্ট পুরুষ, তাই জুনোর স্বামী জুপিটার ভেসটিনি বা ভাগ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইনিসকে সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। 'ইনিদ' কাব্যে আমরা লক্ষ করি যে নিয়তির একটি পূর্ব-নির্ধারিত এবং সুপরিকল্পিত রূপ আছে।

৫. Sophocles: King Oedipus : E.F. Walting কৃত ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য। The Penguin Classics-এ প্রকাশিত, ১৯৫১।

৬. সেকস্‌পীয়রের ট্রাজেডিতে আমরা লক্ষ করি যে নায়কের আচরণ তার অন্তর্নিহিত সত্তার স্বভাব থেকে উদ্ভূত। ইলিয়টের ভাষার– 'integral with the human nature of his characters'.
(Shakespeare and the stoicism of Seneca)।

৭. প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনে রাবণের আক্ষেপ। চরণ ৮৪–১০৩।

৮. রাবণ-মহিষী চিত্রাঙ্গদা প্রাসাদ-অভ্যন্তর থেকে সভাকক্ষে প্রবেশ করে আপন চিত্তের বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করছেন। চরণ : ৩৯০-৪০৫।

৯. জলতলে বিক্ষুব্ধা বারুণীর নির্দেশে তার সখী মুরলা কমলালয়ে যেয়ে দেবী রমাকে রাবণের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রথমে অনুরোধ জ্ঞাপন করলে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে মেঘনাদকে প্রমোদ উদ্যান থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে আনতে হবে। চরণ : ৬১০–৬১২।

১০. মেঘনাদবধ কাব্য : প্রথম সর্গ : চরণ : ৪১০–৪১৬।

১১. হোমারের 'ইলিয়দ' এবং 'ওদিসি' কাব্যে মানুষের পৃথিবীর চতুর্দিকে অপ্রাকৃত দেবলোকের অবস্থিতি। দেবলোকের অধিবাসীবৃন্দ, অর্থাৎ দেবতাগণ মরণশীল পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সকল প্রকার কর্মধারায় প্রভাব বিস্তার করেন। দেবতাবৃন্দ পৃথিবীর পরম শাসক। মানব ভাগ্যের নির্মাতা এবং নিয়ন্তা, আদর্শ ও নীতিবোধকে তাঁরা রক্ষা করেন। আবার কখনও কখনও তাঁরা প্রাকৃতিক শক্তির অথবা মানুষের আবেগ, চিন্তা ও স্বপ্নের প্রতীকরূপে উপস্থিত হন যাকে ব্যক্তুৎপ্রেক্ষণ বা পারসনিফিকেশন বলা চলে।

হোমারের দেবকুলের মধ্যে সর্বশক্তিমান হচ্ছেন 'জিউস'। তিনি ক্রোনেস এবং রিয়ার পুত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুজন ভ্রাতা হচ্ছেন 'পসিতন' এবং 'হেডিস্'। এঁরা

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন, তখন স্বর্গের অধিকার পেলেন জিউস। সমুদ্র এবং জলতলের অধিকার পেলেন পসিতন এবং অন্ধকার পাতাল বা মৃতের রাজ্যের অধিকার পেলেন 'হেডিস্'। কিন্তু পৃথিবীর উপর সকলের অধিকার সমভাবে রইলো। হোমার জিউসকে অলিম্পাস পর্বতের শিখরদেশে অবস্থানরত বলে কল্পনা করেছেন, যে শিখর স্বর্গ ভেদ করে দূরলোকে চলে গিয়েছে। আগ্রহী পাঠক ২-সংখ্যক টীকায় উক্ত : 'A Dictionary of Greek and Roman Biography' দেখতে পারেন। Robert Graves রচিত 'The Greek Mythis' (Pengiun Books) গ্রন্থেও গ্রীক দেবকুলের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যাবে।

১২. Homer: The Iliad-Translated by E. V. Rien: The Penguin Classics.

১৩. মেঘনাদবধ কাব্য : ষষ্ঠ সর্গ : চরণ ৫১–৫২।

১৪. ঐ : চরণ ৭০–৮৪।

১৫. ঐ : পঞ্চম সর্গ :চরণ ৪৬৮–৪৭০।

১৬. ঐ : চরণ ৪৭৯–৪৮৯।

১৭. ঐ : তৃতীয় সর্গ : চরণ ৪৩৫–৪৪০।

১৮. ঐ : চরণ ৪৫২–৪৫৬।

১৯. ঐ : দ্বিতীয় সর্গ :চরণ ৪২৬–৪৩৮।

Dr. Milton Biswas
Professor
Bangla Department
Jagannath University Dhaka